ভাঙা বাঙলার সাহিত্য

অশ্রুকুমার সিকদার

'But in seven weeks it was done, frontiers decided/A continent for better or worse divided'. স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ভারতবর্ষকে দু'-ভাগে ভাগ করে গেলেন। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনায় বাংলাভাগ নিয়ে যে-সাহিত্য গড়ে উঠেছে বা যে-সাহিত্য গড়ে ওঠেনি, কিন্তু গড়ে উঠতে পারত, তাই নিয়ে এই প্রবন্ধের বিচার।

প্রথমেই দেখা যায়, দেশভাগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্যে যতটা আকুলতা, পূর্ববঙ্গের বাংলা সাহিত্যে ততটা নয়। এর কারণ আমরা বিবেচনা করতে পারি। তথ্য যা বলে সেই নেহাত-সত্যের স্বীকৃতি আছে রফিকুল ইসলামের কথায়, "যে বিপুল সংখ্যক বাঙালি হিন্দু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে গেছে, তত বাঙালি

জন্ম ১৯৩২। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার পর অবসরগ্রহণ করেছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যসমালোচক। কয়েকটি বইয়ের নাম: *রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য* (১৯৬৭), *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়* (১৯৭৪), *নবীন যদুর বংশ* (১৯৯১), *ভাঙা বাংলা ও বাংলা সাহিত্য* (২০০৫)।

Scanned with CamScanner

মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গে আসেনি— এসেছে অবাঙালি মুসলমান মোহাজের। ফলে দেশভাগজনিত মানবিক সমস্যাগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি সাহিত্যিকদের কাছে।'' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকদের কাছে। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে বিপুল পরিমাণ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু চলে আসায় যে সংকট তৈরি হয়, পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গে অনেক কম মানুষ চলে যাওয়ায় তেমন সংকট তৈরি হয়নি। তৈরি হয়নি বলে, তার অভিঘাতও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে পড়েনি। যারাও-বা চলে গিয়েছিল, তারা সংখ্যায়-বেশি, অনেক বেশি সম্পদশালী হিন্দুদের জমিতে, বাড়িতে, চাকরিতে, পেশায় সহজেই পুনর্বাসিত হয়েছে। তাদের দীর্ঘদিন কোনও আশ্রয়শিবিরে থাকতে হয়নি, বা সংগ্রাম করে কোনও জবরদখল কলোনি গড়ে তুলতে হয়নি। তাছাড়া ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানের কাছে দেশ বিভাগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল স্বাধীনতা। তাদের কাছে এই স্বাধীনতা ছিল দ্বিগুণ স্বাধীনতা; একবার ইংরেজের শাসন থেকে, সঙ্গে-সঙ্গে এতদিনকার চেপে-বসা হিন্দুদের আধিপত্য থেকে। দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল এবং পুববাংলায় এই শ্রেণী লাভবান হয়েছিল। আর এই লাভবান মধ্যশ্রেণীর ভিতর থেকেই লেখকেরা উঠে এসেছিলেন। তাই দেশভাগের ক্ষতির চেয়ে তাৎক্ষণিক শ্রেণীগত লাভটাই বড় হয়ে উঠেছিল তাঁদের চোখে। তাঁদের রচনায় দেশবিভাগের বেদনা ও প্রাসঙ্গিক মানবিক সমস্যার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল 'নবীন পাকিস্তানকে সব পেয়েছির দেশে পরিণত করার স্বপ্নকল্পনা।' সেলিনা হোসেনের 'গায়ত্রীসন্ধ্যা' গল্পে পূর্ণ-গর্ভবতী পুষ্পিতা, স্বামী আলি আহমেদের সঙ্গে রেলগাড়িতে করে পাকিস্তানে পালাচ্ছে। নবজাত পাকিস্তানে সে তার নবজাতকের জন্ম দিতে চায়। ট্রেন রাজশাহী পৌঁছায়। সদ্যোজাত শিশুর নাম হবে প্রতীক আহমেদ, পাকিস্তান জন্মের প্রতীক। এই আশাবাদ পুববাংলার দেশভাগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা হিন্দুদের তুলনায় সংখ্যায় যত কমই হোক, তবু বেশ কিছু বাঙালি মুসলমান পশ্চিম থেকে পুববাংলায় চলে গিয়েছিল। ঋত্বিক ঘটকের 'মড়ক' গল্পে ইজরাইল পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে লম্পট প্রমথ'র প্ররোচনায় দাঙ্গা লাগলে মুসলিম পরিবারকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল। 'কৃষ্ণ বোলই' আগস্টে কলকাতায় দাঙ্গা লাগলে,

শেষবারের মতো প্রিয় বিদ্যায়তন মিত্র ইনস্টিট্যুশনের দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে মীজানুর রহমানকে শেষ পর্যন্ত কমলালয়া কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে হয়। শিল্পী প্রকাশ কর্মকার 'আমি' নামক স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, দাঙ্গাবাজেরা তাঁর শিল্পী-বাবার মৌলবি মডেলকে প্রকাশের সামনেই হত্যা করে। প্রকাশ অকপটে জানিয়েছেন, আক্রান্ত মুসলমান শিকার 'খোঁচাতে খোঁচাতে নিথর না হওয়া পর্যন্ত' তাঁরা নৃশংসতা চালিয়ে যেতেন। এইসব অনাচারের পর প্রকাশ লিখেছেন, ''মুসলমানরা তাদের সর্বস্ব ছেড়ে কেন চলে গেল, এতো লোক তাদের ঘরবাড়ি সংসার, আবাল্য স্মৃতি, রুজি-রোজগার ছেড়ে কোথায় চলে গেল বা চলে যাচ্ছে, তা হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। মায়াহীন এই পরিত্যক্ততা আমি মানতে পারিনি।'' অদ্ভুত এই মানতে না পারা!

কাটা-দেশ নিয়ে বেদনায় পীড়িত হয় হাসান আজিজুল হকের 'একটি নির্জলা কথা' গল্পের সব-হারানো নারী। 'কুন্ দোজখিরা দ্যাশ ভেঙেছে, তাতে আমার কী?' গলায় দড়ি বেঁধে অনিচ্ছুক তাকে যেন টানতে-টানতে পশ্চিম থেকে পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু না-যাওয়ায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হাসান আজিজুল হকের এখন-পর্যন্ত একমাত্র, সম্প্রতি-প্রকাশিত 'আগুনপাখি' উপন্যাসের নায়িকা। এই নামহীনা সামান্য-সাক্ষর মুসলমান নারী পশ্চিমবাংলার একটি গ্রামের গণ্ডির মধ্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিল। তার এই নিতান্ত পরিবারকেন্দ্রিক জীবনের মধ্যেও ছায়াপাত করেছে সময়— মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগের মধ্য দিয়ে। সে ভাবতে পারে না মানুষকে কদু-কুমড়োর মতো কাটা যায়, কিন্তু কলকাতার দাঙ্গায় কাটা পড়ল রায়বাড়ির সত্য, আর গ্রামের দাঙ্গায় ইসুফমিয়ে। নয় বছর থেকে এই সংসারে-লগ্ন নারী শুনছে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশের আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই পাকিস্তান ব্যাপারটা সে কত্তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে চায়, কত্তাও যে বোঝে তা নয়। 'ছি ছি ছি! সবাই কি সব ভুলল? এক মাঠ, এক ঘাট, এক রাস্তা, এক খরানি, এক বর্ষা এক ধন'। এক সময় দাঙ্গা থেমে যায়, জ্বর নেমে যাওয়ার মতো। 'দাঙ্গা তো জেবনের নিয়ম নয়, শান্তিই জেবনের নিয়ম।' কিন্তু দেশভাগ হলই। 'বড়ো লোক অবস্থাপন্ন মোসলমানদের লেগে ভালো ঢল নেমেছে পাকিস্তানের দিকে', চাকরি পেয়ে বড় ছেলে জামাই পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। এই বিষাদিনী নারীর মনে হয়, সমাজসংসার সব ভাঙবে, 'এ্যাকটো গোটা মানুষও আর গোটা থাকবে না।' এই নারীর ফসীও

Scanned with CamScanner

বাড়ি বদল করে পূর্ব পাকিস্তানে ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনির কাছে চলে যেতে চায়। মাথায় বাজ পড়ে তার, 'পিথিমি ঘুরে উঠল আমার চার পাশে।' সে কত্তার কথা মেনে নিতে পারছে না, দেশভাগ মেনে নিতে পারছে না, 'আসমান তো দুরকম নয়।' দেশভাগকে প্রত্যাখ্যান করে এই পোড়-খাওয়া প্রবীণা। তাকে কেউ বোঝাতে পারল না কেন একটা আলাদা দেশ হয়েছে গোজামিল দিয়ে 'যিখানে শুদু মোসলমানরা থাকবে কিন্তুক হিঁদু কেরেস্তানও আবার থাকতে পারবে। তাইলে আলেদা কিসের? আমাকে কেউ বোঝাইতে পারলে না যি সেই দ্যাশটো মোসলমান বলেই আমার দ্যাশ আর এই দ্যাশটি আমার লয়।' সে বুঝতে পারে না স্বামী ছেলেমেয়ে অন্য দেশে গেছে বলেই তাকে সেখানে কেন যেতে হবে। সবাই চলে গেল, সে গেল না। সে একা হয়ে গেল। আবার, একাও নয়, কেননা সে যায়নি আর যায়নি দিঘির পাড়ে কবরের মধ্যে চিরঘুমে ঘুমিয়ে থাকা চিরকিশোর প্রথম সন্তান তার। এই বেদনাজর্জর অথচ দেশভাগ প্রত্যাখ্যান-করা আত্মস্থ নারীর স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে হাসান আজিজুল হক দেশভাগের যন্ত্রণাকে মর্মস্পর্শীভাবে রূপায়িত করেছেন।

দুই

বঙ্গসংহারের মর্মান্তিক ঘটনা বিষয়ে পূর্ববাংলা/বাংলাদেশের সাহিত্যে যতটা নীরবতা ভারতের বাংলা সাহিত্যে ততটা নয়। কিন্তু এপারেও এক ধরনের নীরবতার মুখোমুখি হই আমরা। দেশভাগ-দেশত্যাগ নিয়ে এপারের বাংলা সাহিত্যের নীরবতার কারণ বুঝতে গেলে অখণ্ড কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা খানিকটা জানা দরকার। কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করত মুসলিম লিগের তোলা পাকিস্তানের দাবি ন্যায্য ও যুক্তিসংগত। কারণ এই দাবির পিছনে রয়েছে সংখ্যালঘু মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন। এই বাবদে কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে সংশয় ছিল না তা নয়। রজনী পাম দত্তের মতো নেতা বারবার মনে করিয়ে দেন, ধর্মের ভিত্তিতে জাতিসত্তা দাঁড় করালে সাম্প্রদায়িক শত্রুতা বাড়বে এবং মাউন্টব্যাটনের ভারতভাগের পরিকল্পনা 'has nothing in common with national self-determination'. কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঙ্গাধর অধিকারীর থিসিসই বজায় থাকে। এই পার্টি-লাইনে গান বাঁধতে গিয়ে কেমন যৎপরোনাস্তি নাকাল

হতে হয়েছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে, তার কৌতুকজনক বর্ণনা আছে তাঁর 'উজান গাঙ বাইয়া' স্মৃতিকথায়। দেশভাগ হয়ে গেলে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসতে শুরু করল অগণিত ছিন্নমূল শরণার্থী। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে নিজেদের ভূমিকার ফলে, জনযুদ্ধনীতির দরুন, পাকিস্তানপ্রস্তাব সমর্থন করায়, রণদিভে নেতৃত্বের হঠকারিতায় কম্যুনিস্ট পার্টি তখন বিচ্ছিন্ন, দুর্বল। তারপর, তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপে কৃষক-অভ্যুত্থানের ফলে পার্টি মনে করেছিল বিপ্লব আসন্ন। বিপ্লব হলে দেশভাগের সমস্যা মিটে যাবে, সীমান্ত ব্যাপারটাই অবান্তর হয়ে যাবে। উপরন্তু পার্টি মনে করত, উদ্বাস্তুরা স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক, তাদের সমর্থন করলে বা তাদের কথা সাহিত্যে লিখলে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রগতি লেখক আন্দোলনের সঙ্গে অধিকাংশ বাঙালি লেখক যুক্ত ছিলেন। এমনকী তারাশঙ্কর, সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুও। দাঙ্গা-দেশবিভাগে ছত্রখান হয়ে গেলেও, রণদিভের অতিবাম-বিচ্যুতির পর্বে প্রগতি লেখক আন্দোলন সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে গেলেও, সেই আন্দোলনের তত্ত্বের প্রভাব লেখকদের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের দাঙ্গার পর এই সঙ্ঘের সদস্যদের বিবৃতিতে বলা হয়, বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের কর্তব্য হবে, 'to fight communalism in all its manifestations'। তাই সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বিদ্বেষের মুখে দাঁড়িয়ে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ-দেশত্যাগের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়িয়ে, লেখকেরা হয় নীরবতার আশ্রয় নিয়েছেন, অথবা যান্ত্রিকভাবে সদর্থকতা ও সম্প্রীতির সন্ধান করেছেন, লিখেছেন কিছু তত্ত্বের ছাঁচে ঢালা রচনা। গণনাট্যসংঘের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও শচীন সেনগুপ্ত উদ্বাস্তু-সমস্যা নিয়ে লেখা সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি' নাটকে শ্রমিক নেতা মহেন্দ্রের রাজনৈতিক বক্তব্যে বিরক্তি প্রকাশ না-করে পারেননি। নাটক শেষ হয় হৃদয়হীন শোষকদের অত্যাচার খতম করবার জন্য উদ্বাস্তু-যুবা মোহনের প্রতি মহেন্দ্রের আহ্বানের মধ্য দিয়ে।

লেখকেরা সতর্ক থেকেছেন, পাছে তাঁদের রচনা সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। আর পার্টির প্ররোচনায় যখন সাম্প্রদায়িকতাকে আক্রমণ করা হয়, তখন আক্রমণ করা হয় একদেশদর্শী ভাবে শুধু হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাকে। তার প্রমাণ ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সলিল চৌধুরীর 'মাংসাশীর প্রতি বিজ্ঞাপন' কবিতা—

Scanned with CamScanner

আসুন! আসুন! কার তাজা মাংস চাই
হাতে যেন থাকে খাঁটি খদ্দরের থলি
ভীষণ সস্তা মাংস নিয়ে যান ভাই
অহিংসার হাড়কাঠে দিয়েছি এ বলি,
গরম সাত্ত্বিক মাংস গঙ্গাজলে ধোয়া
রামধুন গেয়ে-গেয়ে তবে বলি দেওয়া।

শব্দের ব্যবহারেই বোঝা যায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও নরহত্যার জন্য শুধু কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায়কেই আক্রমণ করেছেন এই কবি। শেষ দুই চরণে বলা হয়েছে,

ভয় নেই আমাদের মাংস নিরামিষ
সর্বত্রই ব্রাহ্ম আছে, দিল্লি হেডাপিস।

তত্ত্বের দায়ে কঠিন সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার অনেক নজির আমরা পেয়ে যাব দেশভাগের বাংলা সাহিত্যে। 'পথের কাঁটা' গল্পে রমেশচন্দ্র সেন দুটি সমান্তরাল মিছিলের কথা বলেছেন। একটা মিছিল চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে, অন্যটা বিপরীত দিকে। 'সামনে আসিয়া একদল আরেক দলের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। দু-দলের দৃষ্টিই শান্ত, স্থির, তাতে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই। তাহাদের চোখে শুধু একটি প্রশ্ন, তোমাদেরও এই দশা ভাই? এ করল কে? কারা?' প্রশ্নের সঙ্গে সহানুভূতি, দরদ। লেখক চেয়েছেন, মানুষে-মানুষে দরদ থাকুক, আর সেই চাওয়াটা তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন বাস্তবের উপরে। আবার একথা ভুললে চলবে না যে, রমেশচন্দ্র তাঁর 'পূর্ব থেকে পশ্চিম' উপন্যাসে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, ঘৃণা ও অবিশ্বাস তার বাস্তবতাকে তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি। মনোজ বসুর 'এপার-ওপার' গল্পে দেশত্যাগী হিমাংশুর মাঠের ধান তাজমহম্মদ দখল করেছিল। দেশে গেলে হিমাংশুকে অবাক করে সে তাকে ধানের দাম হিসেবে ১০০ টাকা দেয় আর হিমাংশু, তার মতো সম্বলহীন মানুষের পক্ষে এই দান হঠকারিতা জেনেও, গোলাম আলিকে সেই নোটটা দিয়ে দেয় দরগা বানানোর জন্যে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'স্বাক্ষর' গল্পে একসঙ্গে খেটে-খাওয়া মজুর জহুরালি আর দীননাথ ইট আর সোডার বোতল নিয়ে দাঙ্গায় নামে। গল্পের শেষে মিলিটারির ভয়ে বিরোধী দুইজনে আশ্রয় নেয় এক বাড়ির সিঁড়ির নীচে। সাম্প্রদায়িক বিরোধের সরল সমাধান হয়ে যায় যখন একজনের বিড়ি আর অন্যজনের দেশলাই কাছে আনে দু'জনকে। সমরেশ বসুর

'আদাব' গল্পেও সুতামজুর আর নৌকার মাঝি, একজন হিন্দু আর অন্যজন মুসলমান, বিড়ির টানে মিলে যায়। একই ধরনের গল্প নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইজ্জৎ'। জগন্নাথ সরকার নমশূদ্রের পুরোহিত, ডাকাতে কালীর পূজক। কালীর মন্দির আর ফকিরের মাজার এতদিন শান্তিতে পাশাপাশি ছিল। কালীর এই পাশাপাশি থাকাটাই হয়ে ওঠে অশান্তির কারণ। এখানেও বিপরীত দুই ধর্মের দু'জনকে লেখক মিলিয়ে দেন; জগন্নাথ আর ধলা মন্ডাই দু'জনের স্ত্রীরই অঙ্গ পরনের কাপড়ের অভাব। হবিবমিয়ার সদ্য-সমাহিত স্ত্রীবিবির কাপড় চুরি করতে গিয়ে তারা মিলে যায়। লেখকের মন্তব্যে পাঠককে রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয়— 'শত্রুকে আঘাত করতে এখনো ওরা শেখেনি, যা শিখেছে তা শুধু আত্মঘাত।'

এতটাই সরল নয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিখ্যাত গল্প 'পালঙ্ক'। পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া পুত্রবধূর উপর রাগ করে দামি পালঙ্ক গরিব প্রজা মকবুলকে বেচে দিয়েছিল রাজমোহন। পরে হঠকারিতার বোকামির জন্য অনুতাপ হলে পালঙ্ক ফিরে পাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয় সে। গল্পের শেষে মকবুলের বাড়ি এসে সে দেখে পালঙ্কে শুয়ে আছে মকবুলের পুত্রকন্যা, তার মনে হল যেন শুয়ে আছে তার আরাধ্য রাধাগোবিন্দ। যেভাবে রাজমোহন চরিত্রকে লেখক সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান প্রজার সন্তানকে রাধাগোবিন্দ বলে কল্পনা করা অসম্ভব। লেখকের রচনায় এসে গেছে ঔচিত্যবোধের অবাস্তবতা। অনেক বেশি বাস্তব-সত্যের গল্প গৌরকিশোর ঘোষের 'যাহা যায়'। দাঙ্গার দুর্যোগে মুসলমানের দোকানে ঢুকে আশ্রয় নেয় রানু। কেউ কারও উপর আস্থা রাখতে পারছে না বলে দোকানের আলো নেবাতে পারছে না। ফলে শামাপোকার কামড়, তথা অবিশ্বাসের কামড় খেয়েই চলেছে। তত্ত্ব আর সত্য চমৎকারভাবে মিলে গেছে প্রফুল্ল রায়ের 'মাঝি' গল্পে। নিজের বিয়ের জন্য টাকা জোগাড়ে ব্যস্ত ফজল বাড়তি উপার্জনের সুযোগ পেয়ে যায় যখন ইয়াসিন এক হিন্দু মেয়েকে তার নৌকায় তুলে চর ইসমাইলের দিকে যেতে উদ্যোগী। অপহৃতা মেয়েটিকে ইয়াসিন খোদ বেগম বানাতে চায়। ছইয়ের ভিতর থেকে আক্রান্ত মেয়েটি যখন তীব্র অমানুষিক চিৎকার করে ওঠে, তখন সেই চিৎকার 'ফজলের শিরা-স্নায়ু-মেদ-মজ্জা ফুঁড়ে চেতনায় বিঁধে গেল যেন।' সব ভাবনা হিসাব ভুলে যায় ফজল আর তার কোঁচ অব্যর্থ লক্ষ্যে ইয়াসিনের দিকে ছুটে যায়।

Scanned with CamScanner

তিন

অকাপটোর পথে বাধা শুধু রাজনীতির ছিল না, ছিল নৈতিকতার, নন্দনতত্ত্বের, দার্শনিক-প্রস্থানেরও। আডর্নো একটি বিখ্যাত বাক্যে বলেছিলেন, আউশভিটশের পর কবিতা লেখাই বর্বরতা। নাগাসাকি-হিরোশিমার অভিজ্ঞতা, হলোকস্টের অভিজ্ঞতা, দেশভাগের হিংস্রতা মর্মান্তিকতাও হয়তো 'lies outside speech as it lies outside reason'. কোন-কোন হিংস্রতা বর্ণনাতীত। তবু পল সেলানের মনে হয়েছিল, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যখন সব অস্তিত্বই ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, তখনও অন্তত ভাষা কোনওক্রমে বেঁচে ছিল। সেই ভাষা দিয়েই হলোকস্টের নির্মমতাকে রূপায়িত করেছেন এলি হ্বিজেল, প্রিমো লেভি, পল সেলানের মতো লেখকেরা। তাঁরা কবি হানস মাগনুস এনসেটসেনবার্গারের মতো বুঝেছিলেন, নীরবতার কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ 'surrender to cynicism'। পঞ্চাশের মন্বন্তর বিষয়েও নীরবতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বাঙালি লেখকেরা। তেমনি দুঃখ করে হাসান আজিজুল হক তাঁর 'কথাসাহিত্যের কথকতা' বইতে লিখেছেন, দেশভাগে-দেশত্যাগে মানুষকে 'যখন হাজারে-হাজারে, লাখে-লাখে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে— আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সেই বৃহত্তম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা কেউ লেখেননি।'

দেশভাগে পাঞ্জাবের মেয়েদের অভিজ্ঞতার মর্মান্তিকতা নিয়ে তাঁর 'The Other Side of Silence' বইয়ের জন্য উর্বশী বুটালিয়া মেয়েদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে দেখেছিলেন, মহিলারা মনের গভীরের দুঃস্বপ্নময় ক্ষতের মুখোমুখি হলে চুপ করে যান। অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত যন্ত্রণা ভাষার এলাকায় প্রবেশ করতে চায় না। রিতু মেনন ও কমলা ভাসিন তাঁদের 'Borders and Boundaries' গ্রন্থে বলেছেন, দেশভাগের বীভৎসতা 'reverberate with things unsaid'। লেখকরাও হয়তো নৈতিকতার কারণে, নন্দনতাত্ত্বিক কারণে চেয়েছেন অনেক কথা 'unsaid' থেকে যাক। কমলাবেন পটেল তাঁর গুজরাটিতে লেখা স্মৃতিকথায় বলেছেন, দেশভাগের হিংস্র বীভৎসতা তাণ্ডবনৃত্যের তুল্য। মৃদুলা সারাভাইয়ের সহযোগিনী হিসেবে সেই বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করে নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, এ নিয়ে কি লেখা যায়? কেন লিখব আমি? সেই তীব্র বিবমিষাময় দিনগুলির কথা স্মরণ করলেই মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। আশিস নন্দীও এই

নীরবতার সম্ভাব্য কারণ ভেবেছেন। আমাদের 'imagination of evil failed to cope with it', সেই কারণেই কি এই মৌন? স্বাধীনতা লাভে সুখী মধ্যশ্রেণী হয়তো নিজেদের চেতনা থেকে এই গণহত্যার হিংস্রতাকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিল তাই 'silence became their main psychological defence.'

এই প্রশ্নটি বিবেচনা করেছেন দেশভাগের গল্পসংকলন 'রক্তমণির হারে'-র ভূমিকায় দেবেশ রায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'বাংলা গল্প-উপন্যাস এমন স্তব্ধ হয়ে গেল কেন দেশভাগ-স্বাধীনতার ঘটনায়?' তিনি মনে করেন এই নীরবতা ঘটেছিল সচেতন শিল্পগত কারণে। "কোনো-কোনো সময় এমনও আসে শিল্প-সাহিত্যের এক-একটি ফর্মে, যখন সেই ফর্ম তার দুটিমাত্র হাতকেও গুটিয়ে ফেলে তার সময়কে প্রত্যাখ্যান করতে।" দেশভাগের সময়কে তেমনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল কথাসাহিত্যের ফর্ম। তাছাড়া হয়তো নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করা হত 'ঐ বাস্তবকে আঁকড়া গল্প উপন্যাসে আনলে', এমন ভেবেছেন দেবেশ রায়। নচেৎ অন্যভাবে এই নীরবতার নৈতিক-নন্দনতাত্ত্বিক কারণ খুঁজেছেন মিহির সেনগুপ্ত তাঁর 'বিষাদবৃক্ষ' স্মৃতিকথায়। অবক্ষয়ের চিত্র আঁকা "এ যে স্বদেহ কণ্ডুয়ন করে স্বদেহ ভক্ষণের চিত্র। এ নিয়ে কিছু সৃজন করা তো অবক্ষয় নিয়ে নির্মাণ। অবক্ষয়ের রূপকল্প কি জীবনধর্মী শিল্পীরা করতে পারেন?" নৈতিক বিশ্ব ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল যে-সময়ে সেই সময়ের হিংসা-বিদ্বেষকে রূপায়িত করা কি উচিত হবে?

দেশভাগের দাঙ্গার সুযোগে ভিন্ন ধর্মের পুরুষের দ্বারা মেয়েদের ঘটেছিল 'widespread sexual savagery'। বিরোধী ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে অপমান করবার চূড়ান্ত উপায় নারীধর্ষণ। সেই যৌন-নির্যাতনের চিহ্ন শরীরে মনে থেকে গেছে, নিজের পরিবার নির্যাতিতাকে ফিরিয়ে নেয়নি। মেয়েদের যৌন-শুচিতা আর সম্প্রদায়ের সম্মান সমার্থক, এই পিতৃতান্ত্রিক সমীকরণে ঘটেছিল যেমন ধর্ষণ, তেমনি বহু আত্মহননের ঘটনা। পিতৃতান্ত্রিক মগজ-ধোলাইয়ের ফলে বহু মেয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, বরং মরে যাব, তবু ধর্মান্তরিত হব না। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে ধর্ষিতা ঝিনুক দিনরাত শূন্য ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকে, সব সময় আতঙ্কিত হয়ে থাকে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের ধর্ষিতা মালতী বারেবারে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প'-এর কুমু দিদিকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, 'আবদুল গনির অঙ্কশায়িনী

Scanned with CamScanner

হওয়ার চেয়ে ধলেশ্বরীকেই বরণ করে নিলাম।' জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের নায়িকা সুতারা যখন নিরাশ্রয়, তখন বাল্যবন্ধু সাকিনা প্রস্তাব দিয়েছিল, বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুতারা তাদের পরিবারের একজন হয়ে যাক। সুতারা উত্তরে বলেছিল, যে-সম্প্রদায়ের মানুষ তার বাবা-মা'র মৃত্যু ও দিদির অপহরণের জন্য দায়ী, সেই সম্প্রদায়ের মানুষকে সে আপন করে নেবে কেমন করে? দেশভাগের সাহিত্যে অনেক নীরবতা, নারী সম্বন্ধে সেই নীরবতা আরও গভীর। কেন নিপীড়িতা ধর্ষিতা নারী বিষয়ে সাহিত্যের এই নীরবতা, তার কারণ অসামান্য ভাবে বলবার প্রয়াস পেয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের ভূমিকা-স্বরূপ 'আমার কথা'য়। মহাভারতের মৌষলপর্বে অর্জুনের সামনে কিছু নারী লাঞ্ছিত অপমানিত হলে, কিছু নারী দস্যুদলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে গেল, কিছু নারীর সম্ভবত মৃত্যু হল। সব কথা লিখতে পারেননি ব্যাসদেব, কারণ—

> মহাকবি হলেও পুরুষ, কাপুরুষের নারীদেহের ওপর সেই অত্যাচারের বর্বর লাঞ্ছনার কাহিনী লিখতে পারেন না। লজ্জা ধিক্কারে তাঁর লেখনী অভিভূত মূক স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই পুরুষকবি সেকথা লেখেননি।
>
> কাপুরুষ তো ইতিহাস লেখে না। নারী কবি, মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান লজ্জা মর্যাদা সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়নি।

পল সেলান বলেছিলেন সব কিছু যখন ধ্বস্ত হয়ে যায় তখনও ভাষা বেঁচে থাকে। জ্যোতির্ময়ী দেবী যেন প্রতিবাদে বলেন, 'সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্ট হয়নি।' তাই দেশভাগের লাঞ্ছনা, বিশেষ করে নারীর প্রতি লাঞ্ছনায় বাংলা সাহিত্যের এমন নীরবতা।

চার

রাজনীতির, নৈতিকতার-নন্দনতাত্ত্বিকতার বাধা এড়িয়ে কিছু দেশভাগ-দেশত্যাগের সাহিত্য বাংলায় লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে স্মৃতিকথা, উপন্যাস, কিছু কবিতা। ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছে দেশভাগের রাজনৈতিক কারণ আর

দেশভাগের সাহিত্যে উঠে আসে ভারত সংহারের সামাজিক, মানবিক কারণ। ভারতীয় হিন্দু আর ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে ছিল অনেক সামাজিক ব্যবধান। কাজের জগতে একসঙ্গে কাজ করলেও, সংস্কৃতির কোনও-কোনও ক্ষেত্রে নীচের তলায় সমন্বয়ের ভাবনা গড়ে উঠলেও, তারা যাপন করেছে যেন সমান্তরাল জীবন। যখনই কোনও চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তখনই শান্তিপূর্ণ সমান্তরলতা পর্যবসিত হয়েছে হিংসায়-বিদ্বেষে।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সামাজিক দূরত্বের কথা বাংলা সাহিত্যে আমরা বারে-বারে পাই। গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' উপন্যাসের বিলকিস আর টগর খুবই বন্ধু। কিন্তু জলের ঘড়া কাঁখে থাকা অবস্থায় টগরকে বিলকিস ছুঁয়ে দিলে, টগরকে ঘড়া মেজে জলে ডুব দিয়ে নতুন করে ঘড়ায় জল ভরতে হয়। অপ্রস্তুত করুণ চোখে বিলকিস দ্যাখে টগরের ঘড়ার ফেলে-দেওয়া জল 'ওদের দুজনের মাঝখানে কেমন একটা মোটা দাগ কেটে' নদীর দিকে নেমে যায়। ওই জলের রেখার মতো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যায় ভিন্নতার এক সুস্পষ্ট রেখা। একই লেখকের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের শেষে মুসলিম লিগের ডাকা ডিরেক্ট অ্যাকশনের দরুন অমিতা আর শামিম প্যারাগনে মিলতে পারে না। পণ্ডিতমশাই মুসলমান ছাত্র ফটিককে জানায়, "তুমি হচ্ছ যবন, আর ধনা হচ্ছে চাঁড়াল। তুমরা দুটোই অস্পৃশ্য। তুমরা যতক্ষণ ঘরে ততক্ষণ জলস্পর্শ করি কী করে?" যবন আর চাঁড়ালও যে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি, সে অন্য প্রশ্ন। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিয়ে নিষিদ্ধ এখনও, আর অশুচি বলে হিন্দু গ্রহণ করত না মুসলমানের ছোঁয়া খাদ্য বা পানীয়। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে ফতিমা উন্মাদ, প্রায়-শিশু মণীন্দ্রনাথকে নিজের হাতে মিষ্টি খাইয়েছিল। সংস্কার এমনই বদ্ধমূল যে, মুসলমান প্রজা ঈশমের তাতে যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়। 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে তাহের তার ব্রাহ্মণ বন্ধুকে গোমাংস খাওয়ানোয় তাহেরের দাদি তাহেরকে খড়মপেটা করে। অতীনের উপন্যাসে বাল্যপ্রণয়িনী ফতিমা ছুঁয়ে দিলে সোনাকে বাড়ি গিয়ে স্নান করতে হয়। জব্বর-কর্তৃক ধর্ষিতা মালতীর আহারের সব জোগাড় করে দেয় মুসলিম মেয়ে জোটন, কিন্তু কোনো কিছু সে ছোঁয় না। পাছে মালতীর জাত যায়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে বালিকা বন্ধুরা একসঙ্গে খেলে, আম কুড়োয়। মুসলমান বালিকাটি সাবধান করে, "ভাই, ওরা হিন্দু, আমাদের এঁটো দিসনি। ওদের মা বকবে।" 'স্বপ্ন ও অন্যান্য

Scanned with CamScanner

নীলিমা' উপন্যাসের সরোজের মধ্য দিয়ে নিজের কথাই বলেছেন লেখক অভিজিৎ সেন। সরোজের বাবা-মা উদার ছিলেন। তাঁদের ঘরে মুসলমান বন্ধুরা আসতেন, জলখাবার খেতেন। তাঁদের একটি ঘরের খাট জুড়ে ছিল অজস্র দেবদেবীর ছবি, পাথরের ও পিতলের মূর্তি। সকালে দুধ দিতে-আসা মুসলমান ছেলে, যার কাছে ওইসব দেবদেবী ছিল নিতান্ত 'পিকচার', তা দেখার কৌতূহলে ঘরে একখানা পা বাড়ায়, আর তাতেই পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। গৌরকিশোরের 'প্রতিবেশী' উপন্যাসে অথচ মুক্তমতি হিন্দু বৃদ্ধা স্মরণ করিয়ে দেয়, 'রেলে যখন উঠিস তখন কে কোন্ জাত তোর সঙ্গে যাচ্ছে, সেটা কি তোরা ভাবিস।' রেলে ছত্রিশজাতের মেলায় মানুষই একমাত্র জাত।

হিন্দুদের পাকিস্তান ছাড়ার দুটি প্রধান কারণ ফুটে ওঠে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনৈক হিন্দুচরিত্রের দুটি বাক্যে— ''এখানে থাকলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করতে হইব। জাত-মান থাকব না।'' পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু হলেও, হিন্দুরা ছিল ক্ষমতাবান, প্রতিপত্তিশালী। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমু বলে, ''একবার চোখ তুইল্যা দ্যাখ্ চাকরি তগ, জমি তগ, জমিদারি তগ। শিক্ষাদীক্ষা সব হিন্দুদের।'' রোজ-রোজ বলতে বলতে এই কথাগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসের চরিত্র ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দের— ''মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।'' একই কথা বলে 'প্রতিবেশী' উপন্যাসের মনসুর। তার তালিকায় যোগ হয়, হাকিম হিন্দু আসামী মুসলমান, খেলোয়াড় হিন্দু দর্শক মুসলমান, জেইলার হিন্দু কয়েদী মুসলমান। অর্থাৎ একদিকে ক্ষমতা, অন্যদিকে ক্ষমতাহীনতা। এতদিন যে প্রতিষ্ঠা আর ক্ষমতা ভোগ করে এসেছিল হিন্দু সম্প্রদায় তা হারানোর ভয়েই তারা দেশত্যাগ করে।

নিয়াজ জামান সম্পাদিত 'A Divided Legacy' সংকলনের কথাসাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দেশভাগের বাংলা সাহিত্যে মূলত আছে 'displacement'-এর কথা। দেশভাগের ফলে ভারতবর্ষের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তে ঘটেছিল, ইতিহাসে যেমনটি আর ইতিপূর্বে ঘটেনি, তেমন 'mass exodus of people' পায়ে হেঁটে, ট্রেনে, নৌকায়-স্টিমারে, সামান্য সম্বল নিয়ে বা নিঃসম্বল অবস্থায় মানুষ স্বজন হারিয়ে বা না-হারিয়ে, শরীর-মনে ক্ষত নিয়ে, এক

গণপ্রব্রজনে পথে নেমেছিল। সেই পথে চলার কথা বাংলায় বিশেষ লেখা হয়নি। রাতদুপুরে ঘোরের মধ্যে ভিটেমাটি ছেড়ে পথে নেমেছিল এক 'দীর্ঘযাত্রী দলদঙ্গল'। সাবিত্রী রায়ের 'স্বরলিপি' উপন্যাসে নায়ক পৃথ্বী প্রণয়িনী সীমার সন্ধানে এসে দ্যাখে বরিশাল এক্সপ্রেস থেকে বিপর্যস্ত ছিন্নমূল মানুষ স্রোতের মতো নেমে আসছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'নির্বাস' উপন্যাসে 'রুগ্ন, অভুক্ত, অস্নাত হাজার লোকের পূতিগন্ধ জনতা'-র মিছিলের কথা আছে। দিনেশচন্দ্র রায়ের 'কুলপতি' নামের ছোটগল্পে কথক বধূটি স্বামী আর শ্বশুরকে নিয়ে দেশত্যাগ করতে পথে নেমেছে। অন্ধকার রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লুঠেরারা। উপন্যাসের ছদ্মবেশে স্মৃতিকথা 'পিতামহী'-তে শান্তা সেন এই গণপ্রব্রজনের, এই দলবদ্ধভাবে দেশ ছেড়ে আসার সর্বনাশা সময়ের অথেনটিক বিবরণ দিতে পেরেছেন ঠাকুমার জবানিতে। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পড়ি 'আমার বুকে পালানোর পালানোর আরো পালানোর দেশজোড়া স্মৃতি'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশের মেমিও থেকে 'উজান স্রোতে'-র লেখিকা নীলিমা দত্ত ও তাঁর পরিবারের সবাই ট্রেনে, স্টিমারে, নৌকায়, গোরুর গাড়িতে, পায়ে হেঁটে, ছয় লক্ষ মানুষের অন্তর্গত হয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন। ভারতের মাটিতে পা দিয়ে নীলিমা ভেবেছিলেন 'আর ভয় নেই। এ দেশ আমার।' কিন্তু এ-দেশও আমার থাকল না যখন চট্টগ্রাম থেকে দেশভাগের দরুন আবার তাঁদের পথে নামতে হল। অতি বিশ্বাসভাজন এক মুসলমান প্রজা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে বলে, 'মা-ঠাইন, অহিজ রাইতেই আপনাগো ঘরে আগুন দিব। আপনারা পলাইয়া যান।' তাই পথে নামা। এই মর্মান্তিক গণপ্রব্রজনের কথা বেশি নেই বাংলা সাহিত্যে। তাদের কথাও নেই, যারা দিনের পর দিন মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্বপশ্চিম' উপন্যাসের হারীত মণ্ডল বলে, ''সত্যই আইশ্চর্য শহর। শিয়ালদহ ইস্টিশনে রিফিউজি কিলবিল করত্যাছে, তারই মধ্য দিয়া হৈ হৈ করতে করতে বনভোজন পার্টি যায়।'' এই প্ল্যাটফর্মে পড়ে-থাকা নিরাশ্রয় মানুষগুলি যেমন বনভোজন পার্টির দ্বারা উপেক্ষিত, তেমনি বাংলা সাহিত্যের কাছেও উপেক্ষিত।

এই উৎখাত মানুষেরা কেউ উৎখাত হতে চায়নি। 'কেয়াপাতার নৌকো'-র হেমনাথ ভাবে কোনও অন্যায় তো সে করেনি, তবে কেন দেশ ছাড়বে? শঙ্খ ঘোষের 'সুপুরিবনের সারি' উপন্যাসে নীরুর দাদু পরম বেদনায় বলে,

Scanned with CamScanner

"কাছারিবাড়ির পিছনে সুপুরি বনের সারি, এক একটা করে ওর সবকটা আমার নিজের হাতে লাগানো...ওইখানে পড়ে আছে বাবার মঠ, ঠাকুরদার মঠ, এখনো তোর মা ওখানে নিত্য গিয়ে পিদিম জ্বালিয়ে আসে। এইসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, বলতো আমি যাই কোথায়...।" তবু যেতে হয়, ইতিহাসের ঘূর্ণিঝড় তাকে উৎখাত করে, যেমন উৎখাত করে হাসান আজিজুল হকের গল্পের প্রবীণাকে। মনের মধ্যে থেকে যায় শুধু স্মৃতির পুঞ্জ। নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প'-এর বাসিন্দারা নদীমাতৃক দেশের মানুষ; নলকূপের জলে তাদের তৃষ্ণা মেটে, প্রাণ ভরে না। অমিয়ভূষণের 'নির্বাস' উপন্যাসের চরিত্র অনুভব করে 'পদ্মা যে দেশে প্রবাহিতা সেটাই দেশ। তার বাইরে পৃথিবী আছে, দেশ নেই।' অমর মিত্রের 'দমবন্ধ' গল্পের প্রভাময়ীর মন পড়ে থাকে পুববাংলায়। ট্রানজিস্টারে সে ফেলে-আসা দেশের খবর শোনে। তার ঘরের মধ্যে চলে আসে ফেলে-আসা নদীর গন্ধ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' উপন্যাসে ললিতের মা শুধু 'নদী, নৌকা আর গাছগাছালির গল্প' করে, ঘুম আর স্বপ্নের মধ্যে তার ঘটে যেন 'এক অলৌকিক নিরুদ্দেশ যাত্রা'। 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসে অবনীমোহনকে যখন নির্বাসিত হতে হয় তখন তার মনের মধ্যে চিরকালের জন্য থেকে যায় বাংলাদেশের স্নিগ্ধ মনোরম রূপটি। একজন কবির ভোরের নিদ্রায় হানা দেয় 'শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের'। 'দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার', পঞ্চাশ বছর পরেও 'তোমার মাটির কাছে পড়ে আছে' মন।

সমীরণ দাশগুপ্তের চিত্তাকর্ষক, শব্দগন্ধময় স্মৃতিকথা 'সাতনরী'-তে উন্মথিত হয় মাথার উপর জামের গাছ, তার উপরে নিকষ মেঘের ছায়ার কথা, 'বরিশাল শহরের বাইসকোপ হল, ফটফইট্যা ইলেকটিরি আলো', গণিমিঞা-নাগরমোল্লার কবিগানের আসর, বালাম আর কাজলশাইল ধানের দেশের, 'গাঁয়ের শেষ সীমায় এই ডিগম্বরী খোলায় আছে কেবল একটি ঝুরিনামা বটগাছ'-এর কথা। নীলিমা দত্ত তাঁর স্মৃতিকথায় রোমন্থন করেন বৈশাখে গ্রামের বউদের হিঙ্গুলি নদীর তীরে একত্র হয়ে নদীপুজো থেকে শুরু করে চৈত্রে শীতলাপুজোর একের পর এক গ্রামীণ উৎসবের, ব্রতের, পার্বণের। সবচেয়ে অনন্য ছিল আলপনা দেওয়া— 'বাড়িতে-বাড়িতে মেয়েদের আঙুলের ডগা থেকে ঝরনার মতো নেমে-আসা ফুলপাতা, ধানছড়া, লক্ষ্মীর পা।' ১৯৫০ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত

হয়েছিল 'ছেড়ে আসা গ্রাম' নামে অনেক রচনা। পুববাংলা ছেড়ে-আসা মানুষেরা এইসব রচনাগুলিতে বলেছিলেন তাঁদের ছেড়ে-আসা গ্রামের স্মৃতি। কথকেরা আলাদা-আলাদা মানুষ, কিন্তু আশ্চর্য তাদের অনুভূতির ঐক্য। প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় নিজের গ্রামের কথা বলা হয়েছে মায়ের উপমায়— 'গ্রাম নয়। জননী।' গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণা, জলবিন্দু, লতাগুল্মের সঙ্গে প্রাণের যোগ। দেশভাগে সেই মা-ই যেন ধর্ষিতা হল। দেশভাগে পুববাংলা ছেড়ে হিন্দুরা চলে এল, আর তাদের চলে আসায় বেদনার্ত হল সেখানকার অনেক বাঙালি মুসলমান। শহীদুল্লা কায়সরের 'সংশপ্তক' উপন্যাসে সেকান্দার মাস্টারের কথায় সেই বেদনাবোধ। কবি জসীমউদ্দীন 'বাস্তুত্যাগী' কবিতায় লিখেছেন, তুলসীমঞ্চ জঙ্গলে ভরা, দোলমঞ্চে ফাটল, পদ্মদীঘির জল রাঙা মেয়ের 'আলতা-ছোপানো চরণ দুখানি'-র কথা ভুলতে পারে না। 'সুপারির বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ/নারকেলতরু ঊর্ধ্বে খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ।'

পাঁচ

ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ যখন সীমান্ত পেরিয়ে অন্য দেশে নিরাপত্তার সন্ধানে চলে যায়, তখন তারা 'remain suspended, hanging between the two worlds'. একদিকে স্মৃতির মধ্যে থেকে যায় ছেড়ে-আসা অতীত, অন্যদিকে বর্তমানে তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয় জীবন, বিশুদ্ধ বাঁচার মৌলিক তাগিদে তাকে ব্যাপৃত থাকতে হয়। পুববাংলা থেকে উৎখাত হয়ে আসা মানুষেরা নিজের-নিজের অবস্থা অনুযায়ী আশ্রয়-বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। অবস্থাপন্নেরা জমি কিনে বাড়ি করে নিল, কেউ জবরদস্তি দখল করে নিল বা বিনিময় করে নিল পুববাংলায় চলে যাওয়া মুসলমানের বাড়ি, কেউ আশ্রয় নিল পরিত্যক্ত সামরিক ছাউনিগুলিতে গড়ে-ওঠা সরকারি শিবিরে। বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষ বাঁচার তাগিদে সরকারি বা বেসরকারি জমি দখল করে গড়ে তুলেছিল অনেক উদ্বাস্তু-উপনিবেশ। মণিকুন্তলা সেন যথার্থই বলেছেন, এক-একটি কলোনি যেন এক-একটা সংগ্রামের দুর্গ। মালিকের গুন্ডাবাহিনী বা পুলিশ উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে এলে মেয়েপুরুষেরা একযোগে প্রতিরোধ করে। ইদানীং প্রশ্ন ওঠে আন্দোলনের সময় পুলিশের মুখোমুখি মেয়েদের এগিয়ে দেওয়া হবে কেন,

Scanned with CamScanner

তখন বলা দরকার তেভাগা আন্দোলনে যেমন, তেমনি কলোনিরক্ষার সংগ্রামে অকুতোভয় মরিয়া মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তখন তাঁদের বলা হত বীরাঙ্গনা। এই বীরাঙ্গনাদের সম্পর্কে প্রফুল্ল চক্রবর্তী তাঁর *The Marginal Men* গ্রন্থে তাই বলেছেন, "The women volunteers stood in the van against the assault of the police". ছিন্নমূল মানুষদের নতুন দেশের মাটিতে নতুন করে জীবন আরম্ভ করার যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম তার বিশেষ কোনও ছবি বাংলা সাহিত্যে পাই না। লেখা হতে পারত এক সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের মরিয়া লড়াইয়ের মহাকাব্য, কিন্তু তেমনটি লেখা হয়নি।

সেই সংগ্রামের কথা খানিকটা পাই আমরা সাবিত্রী রায়ের 'বদ্বীপ' এবং 'স্বরলিপি' উপন্যাসে। জমির মালিক ভূপাল সাহার গুন্ডাবাহিনী উদ্বাস্তু কলোনি ভাঙতে এলে তাদের তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়। পরানের মা গুন্ডাদের বাধা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়। 'স্বরলিপি' উপন্যাসেও আমরা পড়ি জমির মালিকের গুন্ডারা আক্রমণ করতে এলে কলোনির মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। উদ্বাস্তুদের সামনে মধু মুখার্জি বক্তৃতা দেয়, হিন্দুদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করাই হবে সরকারের প্রধান কাজ। শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেই বাস্তুহারাদের মুক্তি, এইসব কেতাবি কথা উদ্বাস্তুরা বুঝতে পারে না। লেখকজীবনের প্রথম পর্বে লেখা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' উপন্যাসেও কলোনি গড়ার ও কলোনি রক্ষার কাহিনী আমরা খানিকটা পাই। ভেঙে যাচ্ছে পুরনো সংস্কার, বিধিনিষেধ, গড়ে উঠছে নতুন জীবন। বাগানবাড়ির মালিক উদ্বাস্তুদের উৎখাত করতে চায়, প্লাইউড কারখানার মালিক কারখানা সম্প্রসারণ করতে চায়। দু'জনের স্বার্থ মিলে যায় কলোনি ভাঙার উদ্যোগে। আক্রমণে আহত হয় নায়ক অর্জুন। এইসব উপন্যাসের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকি, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ, জবরদখল জমিতে অবিশ্বাস্য তৎপরতায় কলোনিগড়া, পুরনো সামাজিক অবস্থান ভেঙে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, গুন্ডা-পুলিশের আক্রমণ, মেয়েপুরুষদের মিলিত প্রতিরোধ নিয়ে লিখিত হতে পারত যে মহাকাব্যিক উপন্যাস তা এখনও লেখা হল না।

দেশভাগে ক্ষতি হয়েছে অনেক। সামূহিক সর্বনাশে বিপন্ন হয়ে উন্মূলিত অগণিত মানুষ স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। অন্ত্যজ মানুষেরা যারা ছিন্নমূল হয়ে চলে গেছে আন্দামানে বা দণ্ডকারণ্যে তাদের বিষয়ে

দু'-একটি উপন্যাস বাদে, অনেকটাই মৌন থেকেছে বাংলা সাহিত্য। তাদের কথা লিখবার জন্য তাদের ভিতর থেকে উঠে আসেনি কোনও অদ্বৈত মল্লবর্মণ। এইসব ভাঙন বিপর্যয়ের মধ্যে কিন্তু ইতিহাসের প্রচণ্ড আঘাতে উঠে এসেছে কিছু ইতিবাচক দিক। স্টিমারে-ট্রেনে একসঙ্গে যেতে-যেতে, স্টেশনের প্লাটফর্মে পিণ্ড পাকিয়ে থাকতে-থাকতে, ক্যাম্পজীবনের সর্বজনীনতায় ভেঙে গেল খাদ্যাভাসের, ছোঁয়াছুঁয়ির জাতপাতের অনেক সংস্কার। কলোনিগুলিতে ছত্রিশ জাতের একত্র বসবাসে, ওঠায়-বসায়, সংগঠনে-সংগ্রামে ভেঙে যেতে লাগল ভেদ আর সংস্কারের বেড়াজাল। 'নোয়াখালিলা নমঃশূদ্র' আর ব্রাহ্মণ একাকার হয়ে গেল। 'Exiles cross borders, break barriers of thought and experience'. বাঁচার প্রয়োজনে পুরনো সংস্কার অগ্রাহ্য করে নতুন পেশা বেছে নেয় মানুষ। পুকতের ছেলে ট্যাক্সি চালায়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের নায়িকা নার্সিংবৃত্তি নেয়, সন্তোষকুমার ঘোষের 'দ্বিজ' গল্পে দেশবিশ্রুত পণ্ডিতের সন্তান বিড়িশ্রমিক হয়। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'মহাকাল' উপন্যাসে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা গায়ত্রী মহেন্দ্রকে বিয়ে করতে রাজি ছিল না। নোয়াখালির দাঙ্গায় অপহৃতা গায়ত্রীকে জোর করে নিকা করে এক মুসলমান যুবা। পরে গায়ত্রীকে উদ্ধার করা হয়। মহেন্দ্রের বিশ্বাস এবার গায়ত্রী তার প্রস্তাব ফেরাতে পারবে না। কারণ 'যে ধাক্কা আজ হিন্দুসমাজ পেল তা যতো মর্মান্তিক হোক না কেন, তারও প্রয়োজন ছিল। নইলে বিধি-নিষেধের এই জগদ্দল পাথর কিছুতেই ঠেলা যেত না।'

মণিকুন্তলা সেন দেশভাগের ফলে জীবনযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া উদ্বাস্তু মেয়েদের মধ্যে 'একটা অদ্ভুত নবজাগরণ' দেখেছেন। বাঁচার তাগিদে, পরিবারের অন্যদের বাঁচানোর তাগিদে 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নীতার মতো মেয়েরা দলে-দলে প্রবেশ করেছিল কাজের জগতে এবং কাজের প্রয়োজনে শিক্ষার জগতে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে-গল্প অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ফিল্ম, সেই গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত হয়ে আসা পরিবারের বধূ সংসারের প্রয়োজনে চাকরি নেয়। নরেন্দ্রনাথের আর এক উপন্যাসে বরিশালের অভিজাত পরিবারের মেয়ে টেলিফোন-বালিকার চাকরি নেয়। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা অন্তঃপুরের বাইরে এসে যেই চাকরি নিল সঙ্গে-সঙ্গে তারা যেন এক মানসিক ও সামাজিক সীমান্ত অতিক্রম করে গেল। কিন্তু সবাই তো চাকরি পেল না, তাদের লড়াই আরও

Scanned with CamScanner

তীব্র। সমরেশ বসুর 'পশারিণী' গল্পে নিরাপদ মাস্টারের মেয়েকে নিজের বানানো পুতুল ট্রেনে হকারি করে বিক্রি করতে দেখি। দেশভাগ-দেশত্যাগের ফলে পথে বের হওয়ামাত্র ভাঙতে শুরু করে যে পায়ের বেড়ি আর মনের সংস্কার তার এক অনন্য কাহিনী পাই দিনেশচন্দ্র রায়ের 'কুলপতি' গল্পে। যে-বধূটি এই গল্প বলছে, তার শ্বশুরবাড়ি চারপুরুষ ধরে কুলদেবতা কালাচাঁদের সেবায়েত। ঘরবাড়ি, বিষয়সম্পত্তি, কর্মচারী সব কালাচাঁদের। শ্বশুরমশাই কালাচাঁদের নামে প্রবল প্রতাপে জমিদারি শাসন করে খাজনা আদায় করে। 'আমি বাঁদী, আমার শ্বশুর ভৃত্য।' অসহায় তরুণ স্বামী বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সাহস পায় না। মুক্তি এল দেশভাগজনিত দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে। দাঙ্গার সময় অনেক জমিদারি বাড়ির মন্দির অপবিত্র হল। কালাচাঁদকে নিয়ে শ্বশুর, স্বামী, পুত্রবধূ তিনজনেই দেশ ত্যাগ করতে পথে নামে। প্রবল প্রতাপান্বিত কালাচাঁদ এখন বউটির জামার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। পথের মোড়ে-মোড়ে লুঠেরার দল, সামনে অনিশ্চিত জীবন, 'তবু সেটা নতুন করে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে পারব।' পথে বেরিয়ে পড়তেই সারাজীবনের জেলখাটার মেয়াদ যেন মকুব হয়ে যায়। কালাচাঁদকে অনাহারী রেখে নিজেরা খেয়ে নেয়, ভুলে যায় এত দিনকার নিয়ম ও সংস্কার। এই পুরনোকে ভেঙে নতুনকে গড়ার দিনে, বাবার সামনে অসংকোচে আহত স্বামী তার স্ত্রীর হাত ধরে এগোতে পারে। রাতের অন্ধকারে স্বামী গড়িয়ে স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসে আর ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। স্ত্রী বুঝতে পেরে, ব্যথার কারণ যে পাথরের কালাচাঁদ তাকে বুকের নিরাপত্তা থেকে গভীরতর অন্ধকারে ছুড়ে ফেলে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের বাধা দূর হয়। সামন্ততান্ত্রিকতার শাসন থেকে দেশভাগ এই দম্পতিকে মুক্তি দেয়।

দেশভাগ-দেশত্যাগ নিয়ে লিখলে পাছে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পেয়ে যায়, সেই ভয়ে বাংলা সাহিত্য যেন শিটিয়ে ছিল। অথবা সব কথা বলা যায় না বলেই সংকুচিত ছিল। কিন্তু দেশভাগ-দেশত্যাগের ফলে এই যে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন: মুক্তির পথে, আত্মবিকাশের পথে, মানুষ হিসেবে আত্মপরিচয়ের পথে মেয়েদের এই-যে পদক্ষেপ, সেই সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্য কেন বোবা হয়ে থাকল? সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ লাগতে পারে, এই ভয়ে এত বড় ঐতিহাসিক অগ্রগতির দিকেও কি লেখকেরা নজর দিতে ভুলে গেলেন? এইভাবে, ভাঙা বাংলার বাংলা সাহিত্যে কিছু-কিছু কথা বলা হয়, অনেক কথাই অকথিত থেকে যায়।

Scanned with CamScanner